স্বগতোক্তির সন্ধানে

পর্ণা মণ্ডল
স্টেট এইডেড কলেজ টিচার,
বাংলা বিভাগ,
দক্ষিণেশ্বর হীরালাল মজুমদার মেমোরিয়াল কলেজ ফর উইমেন।

নাট্যাভিনয়ে নয়, এ সন্ধান জীবনাভিনয়ের মঞ্চে। শিল্পী-সাহিত্যিক অবশ্যই এই সন্ধানের সীমানা ছাড়িয়ে। কিন্তু আপামর জনসাধারণ? নিজের সাথে কথা বলা, নিজেকে নিজের করে খুঁজে পাওয়া – সব কেমন এলোমেলো হয়ে গিয়েছে বৈদ্যুতিন সম্মোহনে। হাতে গোনা কয়েকজন ছাড়া আমার-আপনার মতো অনেকেরই সেই মায়াজাল ছিন্ন করে বেরিয়ে আসা সম্ভবপর হয়ে উঠছে না।

স্বগতোক্তির হাতছানি যে কতটা দুর্দমনীয়, তা এই আস্বাদ থেকে বঞ্চিত নতুন প্রজন্মের একটা বড় অংশের কাছে হারিয়ে যাওয়া খেলনা-বাটির মতো। ব্যক্তিগত সমস্যা নিরসন, সাংসারিক সুখ বজায়, পেশাগত ক্ষেত্র মোকাবিলা, শক্তিক্ষয় হ্রাস, একাকিত্বের অসহনীয়তা এবং আরও নানান কিছুর সুরাহা স্বগতোক্তি। তাই বলে, পৃথিবীর নির্জনতম দ্বীপে একাকী সাধনা করে স্বগতোক্তির অনুসন্ধান কাম্য নয়। সকলের মাঝে থেকেও তো নিজের সাথে নিজে দিব্য গুছিয়ে কথা বলা যায়। কি আশ্চর্য পরিতৃপ্তি! কি অনাবিল আনন্দ! নিজের কাছে নিজের আশ্রয় পাওয়ার শীতলতা, এই তপ্ত পারিপার্শ্বিকতার মধ্যেও। ভাবুন তো, আপনি হয়তো প্রতিপক্ষ কাউকে পরিস্থিতির চাপে সামনাসামনি পেয়েও মোক্ষম জবাব দিতে দ্বিধাবোধ করছেন, অনায়াসে সেকথা মনে মনে বলে দেখুন। রাগ কিছুটা প্রশমিত হয় কিনা! জীবনে কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ করার আগে অথবা সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে নিজস্ব বিচার-বিবেচনাও স্বগতোক্তির হাত ধরে সফল হতে পারে। শুধুমাত্র চলভাষময় জীবনই জীবনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিকতারও সুরাহা করতে সক্ষম, একথা যতই একাংশের মতামত হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত স্বগতোক্তির বিকল্প নেই। অবশ্যই যুগোপযোগী বৈদ্যুতিন ছন্দে পা না মেলালে, সে জীবনের ওয়াকিং রেস্ থেকে বাতিল। তা বলে, এই যে চলভাষকে সর্বস্ব করে তোলা, এ যেন নিজেদের অন্ধত্বের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। বর্তমান বৈদ্যুতিন মাধ্যমজাত খেলা কতটা মারাত্মক ও জীবনহানিকর হতে পারে, তা আমরা বিগত দিনে দেখেছি, বর্তমানেও দেখে চলেছি ও ভবিষ্যতেও এর রাশ না টানলে আপাত উন্নতির চাকচিক্যে কতটা অন্ধকারে তলিয়ে যেতে হবে, তা ধারণারও বাইরে। আজ থেকে কয়েক বছর আগে আমাদের ছোটবেলায় দেখেছি - পারিবারিক বা সামাজিক কোনো অনুষ্ঠানে নানাজন সম্মিলিত হলে কত আলাপ-আলোচনা, কত স্বতঃস্ফূর্ত হাসি। এখন সেই হাসি নিজস্বীর ফ্রেমে বন্দি। সোশ্যাল মিডিয়ার খাঁচায় বন্দি পাখির মতো সেই হাসিকে ব্যক্তিগত ভালোলাগাটুকুর আকাশে ওড়ার অবকাশ না দিলে যে জীবনে অনেক অনুভূতিই রয়ে যাবে অধরা!

যদিও একুশ শতকের বিশের দশক থেকে যে অতিমারির কবলে জর্জরিত সমগ্র বিশ্ব, তাতে এই মুঠোফোনের প্রয়োজনীয়তা বহুমুখী হয়ে উঠেছে। যোগাযোগ, শিক্ষা, আপদকালীন সংযোগ- সর্বত্র এর শব্দ-নিঃশব্দ অস্তিত্ব। কিন্তু মনের মুক্তির পথ কিছু ক্ষেত্রে দিশা খুঁজে পেলেও, বেশির ভাগ অংশেই মনের বিকাশের প্রতিবন্ধকতা প্রত্যেক মানুষকে বিচ্ছিন্ন দ্বীপে পরিণত করে তুলছে। 'মেঘদূত' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন "আমরা যাহার সহিত মিলিত হইতে চাহি সে আপনার মানসসরোবরের অগম তীরে বাস করিতেছে; সেখানে কেবল কল্পনাকে পাঠানো যায়, সেখানে সশরীরে উপনীত হইবার কোনো পথ নাই (পৃ- ৭১৬)।" এই কল্পনাও তো স্বগতোক্তির এক অঙ্গ। কল্পনার

সম্ভাবনার বীজ যদি দিনের শুরু থেকে রাতের স্বপ্ন পর্যন্ত বৈদ্যুতিন বিকিরণে শুষ্ক হয়ে যায়, তবে বিদ্যাপতির কথা ধার নিয়ে বলতে হবে - ... "অঙ্কুর তপন তাপে যদি জারব, কি করব বারিদ মেহে (পৃ- ১৩৭)।" তবে, দিনের কিছু অংশে যদি বৈদ্যুতিন সম্মোহনের সেই মায়াজাল থেকে নিজেকে ছিন্ন করে নিজেতে মগ্ন হওয়া যায়, তবে সেই শুষ্ক বীজের অঙ্কুর স্বগতোক্তির জলসিঞ্চনে উড়াল দেবে আত্ম-আবিষ্কারের পথে। হারিয়ে দেখা যাক্ই না কোনো মুহূর্তে – জনারণ্যের মধ্যেও মনারণ্যে।

তথ্যসূত্রঃ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'মেঘদূত', ১৩৯৩ (চৈত্র, সুলভ সংস্করণ) রবীন্দ্র রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত) ২০০০ (সংশোধিত তৃতীয় সংস্করণ) 'বৈষ্ণব পদাবলী', বিদ্যাপতি, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা।